মহাকবি হেমচন্দ্র

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

দাম ঃ এক টাকা চারি আনা

শ্রীপ্রহলাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস, ১৫এ,
ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

মহাকবি হেমচন্দ্র

এক

কবিবর হেমচন্দ্র ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ (ইংরাজী ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল) মঙ্গলবার হুগলী জেলার অন্তর্গত গুলিটা-রাজবল্লভহাটে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

হেমচন্দ্রের পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না। দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়। হেমচন্দ্র সেই দারিদ্র্যের মধ্যেই লালিত-পালিত হইয়া বড় হন। উত্তরপাড়ায় কৈলাসচন্দ্রের একটি সামান্য পৈতৃক বাসভবনের অংশ ব্যতীত আর কোনও সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

হেমচন্দ্রের মাতার মাম আনন্দময়ী দেবী। হেমচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্তীর অবস্থাও ভাল ছিল না। আনন্দময়ী ব্যতীত তাঁহার আর কোনও সন্তান না থাকায় তিনি হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্দ্রকে নিজের গৃহে রাখিয়া নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ সহকারে লালন-পালন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের পিতারও অন্য কোনও অবলম্বন না থাকায় তিনি রাজচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন।

রাজবল্লভহাটে রাজচন্দ্রের কিছু জমি ছিল, কয়েকঘর যজমান ছিল এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুরে তাঁহার একটি সামান্য বাসভবন ছিল।

রাজচন্দ্র খিদিরপুরে থাকিয়া মোক্তারি করিয়া যাহা উপার্জন

করিতেন, তাহাতেই তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারের কোনমতে ভরণ-পোষণ-নির্বাহ হইত।

বর্তমানে খিদিরপুরে পদ্মপুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে যে স্থানে হেমচন্দ্রের আবাসভবন অবস্থিত, উহার পূর্বাংশে তাঁহার মাতামহ রাজচন্দ্রের ক্ষুদ্র একতল বাটীতে হেমচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়।

কৈলাসচন্দ্রের চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—হেমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র। হেমচন্দ্রই সর্বজ্যেষ্ঠ।

হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্দ্র বিশেষ কোনও কাজকর্ম করিতেন না। কিন্তু তিনি সত্যবাদী ও স্বাধীন প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন।

রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ায় কৈলাসচন্দ্র কিছুদিন ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবসায় করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী দেবী অতিশয় সরলা, পতিপরায়ণা, ধর্মশীলা ও দানশীলা রমণী ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইত। অবস্থা সচ্ছল না হইলেও আনন্দময়ীর সুব্যবস্থায় কখনও কোনও ভিক্ষুক বা অতিথিকে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হইত না।

হেমচন্দ্রের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সহিত আনন্দময়ীর দানের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

হেমচন্দ্র তাঁহার জননীর কোমল হৃদয় ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি প্রভৃতি সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের দুই সহোদরা বসন্তকালী ও নৃত্যকালীর মধ্যে কনিষ্ঠা নৃত্যকালী অল্পবয়সে বিধবা হইয়া দুইটিমাত্র কন্যা লইয়া পিতৃগৃহে

প্রত্যাবর্তন করেন। ইনিই হেমচন্দ্রের গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। হেমচন্দ্রের পত্নী চিরদিনই স্বল্পবুদ্ধি ছিলেন এবং পরে উন্মাদরোগ-গ্রস্তা হন। নৃত্যকালীই সংসারে লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিয়া সুগৃহিণীর সকল কার্য সম্পন্ন করিতেন।

হেমচন্দ্র সেই আদর্শ বিধবা নারীর ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন :

"হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ্,
মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ ;
সোনার প্রতিমা গড়ে' বিধবা নারীর,
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির ;
বিদেশের স্ত্রী-পুরুষ এদেশে আসিত,
পতিব্রতা বলে' তারে নয়নে হেরিত।
লিখিতাম নিম্নদেশে 'কি স্বদেশে কি বিদেশে
রমণী এমন আর ধরাতলে নাই'।"

দুই

হেমচন্দ্রের শৈশব গুলিটা গ্রামে মাতামহালয়েই অতিবাহিত হয়।

নয় বৎসর বয়সে তিনি খিদিরপুরে আনীত হন। তাঁহার শৈশবের দিনগুলি ছিল বড়ই মধুর,—বড়ই সুন্দর! বার্ধক্যে অন্ধাবস্থায় ভগ্নহৃদয় কবি হেমচন্দ্র শৈশবের সেই সুখময় স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া তাঁহার অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিবার চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার শৈশব ও বাল্যজীবনের স্মৃতি তিনি তাঁহার শেষগ্রন্থ 'চিত্তবিকাশ'-এ 'কি সুখের দিন' শীর্ষক কবিতায় স্বয়ং লিখিয়াছেন ঃ

"শৈশব সময় বর্ষ বার তের
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি একদিন তরে,
জানি না কখন দুঃখ যে কেমন।

তখন (ও) পূজার্হ মাতামহ মম,
সুমেরুর মত উন্নত শরীর।
মাতাপিতা আদি বন্ধু সর্বজন,
সে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির।

সুখে হাসি-খেলি, সুখে আসি-যাই,
সুখেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ,
সুখে পূর্ণ ধরা, শূন্য সুখে ভরা,
সুখেরই প্রবাহ ভাবি জীবন।

আদরে লালিত, আদরে পালিত,
মাতাম'র আর ছিল না কেহ,
অগত্যা তাঁহার আমাদের (ই) প্রতি
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।

আশায় নির্ভর করিয়া আহ্লাদে
জানাইলে তাঁয় মনের সাধ,

কখন (ও) অপূর্ণ থাকিত না তাহা,
পূরাতেন তিনি করিয়া অহ্লোদ।

বৎসরে বৎসরে শারদীয়া পূজা,
হইত আলয়ে আনন্দ সহ,
কতই আনন্দ পেয়েছি তখন,
মাসাবধি ধরি, করি উৎসাহ।

সে আনন্দ-মাঝে আমি শিশুমতি,
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই,
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী-ঘরে
আমার প্রবেশ-নিষেধ নাই।

ষাট বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,
আজও সেদিন ভুলেনি হৃদয়,
সে সুখের স্বাদ আজও আছে।

জননীর স্তন-ক্ষীরের আস্বাদ
একবার জিহ্বা জুড়ায় যার,
যে জেনেছে বাল্য-ক্রীড়ার আহ্লাদ,
জগতে কিছু কি চায় সে আর।"

রাজবল্লভহাটের গ্রাম্য পাঠশালায় হেমচন্দ্রের প্রথম বিদ্যারম্ভ

হয়। অল্প বয়স হইতেই হেমচন্দ্র শান্ত ও ধীরপ্রকৃতি এবং পাঠে মনোযোগী ছিলেন।

প্রাতে বস্ত্রপ্রান্তে একমুষ্টি মুড়কি বাঁধিয়া লইয়া হেমচন্দ্র প্রতিদিন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পাঠশালায় যাইতেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সময়ে সময়ে ভাঙ্গা জালার পিঠে অঙ্ক কষিতেন।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, হেমচন্দ্র নয় বৎসর বয়সে খিদিরপুরে আনীত হন এবং স্থানীয় পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

পাঠশালায় সামান্য বাংলা ও শুভঙ্করী শিক্ষা করিয়া হেমচন্দ্র যখন কৈশোরে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার মাতামহ রাজচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্দ্র বিশেষ কোনও কাজকর্ম করিতেন না এবং শ্বশুরের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। এক্ষণে পরিবারের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল হইল।

এই সময়ে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় হিন্দু কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন। প্রসন্নকুমার পূর্বে খিদিরপুরে বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের জননী একদিন প্রসন্নকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার দুঃখ-দুর্দশার কথা তাঁহাকে জানাইলেন এবং হেমচন্দ্রের জন্য ১৫।২০ টাকার একটি চাকরির চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন।

প্রসন্নকুমার বালক হেমচন্দ্রের সুগঠিত দেহ ও আয়ত চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিতে পরামর্শ দিলেন। হেমচন্দ্রকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইয়া উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার সঙ্গতি তাঁহার নাই শুনিয়া প্রসন্নকুমার স্বয়ং হেমচন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

প্রসন্নকুমারের নিকট হেমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন।

হেমচন্দ্র অসামান্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে মনীষী প্রসন্নকুমারের নিকট নানা বিষয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রসন্নকুমার এই দরিদ্র বালকের কমনীয় স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনুজ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। হেমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, অপূর্ব মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখিয়া প্রসন্নকুমার মুগ্ধ হইলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে হেমচন্দ্র পাঠে এত উন্নতি দেখাইলেন যে, প্রসন্নকুমার তাঁহাকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ-সংশ্লিষ্ট স্কুলের সিনিয়র বিভাগে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দিলেন। তিনিই হেমচন্দ্রের শিক্ষার ব্যয় বহন করিতেন।

হেমচন্দ্র বাল্যকালে প্রসন্নকুমারের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। প্রসন্নদাদার নিকট তাঁহার অপরিশোধনীয় ঋণের কথা তিনি চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেন এবং প্রসন্নকুমারের অনুজগণকে কেবল যে ভ্রাতৃসম্বোধন করিতেন এমন নহে, তাঁহাদের প্রতি সহোদরবৎ বাৎসল্যও দেখাইতেন।

তিন

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে হেমচন্দ্র হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কুল বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন।

হেমচন্দ্র বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় মধুর স্বভাবের গুণে

সহপাঠিগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং পাঠে মনোযোগিতার জন্য শিক্ষকগণের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

সকল বিষয়েই হেমচন্দ্র পারদর্শিতা দেখাইতেন। সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় হেমচন্দ্র প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষা বর্তমান প্রবেশিকা পরীক্ষা অপেক্ষা কঠিন ছিল।

এই পরীক্ষায় হেমচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি দুই বৎসরের জন্য মাসিক দশ টাকা হিসাবে বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তিধারী ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না। সুতরাং হেমচন্দ্রের এই বৃত্তিলাভ তাঁহাদের দরিদ্র সংসারের অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিয়াছিল।

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেমচন্দ্র কলেজ-বিভাগে প্রবেশ করিলেন। এই সময় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়।

কলেজে দুইবৎসর পড়িলে সেকালের ছাত্রগণ সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার লাভ করিত। এই পরীক্ষা বর্তমান I. A. ও I. Sc. পরীক্ষার অনুরূপ ছিল,—সম্ভবতঃ কিছু কঠিনই ছিল। পরীক্ষায় যে-সকল ছাত্র উচ্চস্থান অধিকার করিতেন, তাঁহারা দুইবৎসরকাল মাসিক ২৫৲ করিরা বৃত্তি লাভ করিতেন এবং কলেজে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিবার অধিকার পাইতেন।

হেমচন্দ্র এই বৃত্তি লাভ করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কারণ, এই বৃত্তির উপর তাঁহাদের সাংসারিক উন্নতি নির্ভর

করিতেছিল। হেমচন্দ্রের পিতা ইংরাজী জানিতেন না এবং মাতাও শিক্ষিতা ছিলেন না, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন, পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলে তাঁহাদের সাংসারিক কষ্ট বিদূরিত হইবে। তাঁহারা স্নেহ ও আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে অধ্যয়নরত পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন এবং সর্বান্তঃকরণে নীরবে মঙ্গলময় ভগবানের চরণে সন্তানের কল্যাণ কামনা করিতেন।

পুত্রেরা ইংরাজী পড়িতেন, কি পড়িতেন না, তাহা মাতাপিতা কিছুই বুঝিতেন না। তথাপি রাত্রিতে যতক্ষণ তাহারা পড়িতেন, ততক্ষণ মাতাপিতা উভয়েই পুত্রদের পার্শ্বে বসিয়া, কখনও তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন, কখনও মশা তাড়াইয়া দিতেন, কখনও পাখার বাতাস করিতেন। মাতাপিতা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া পাঠ-নিরত পুত্রগণের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। এই ভাবে কতদিন যে রাত্রি ১টা-২টা বাজিয়া যাইত, তাহার সংখ্যা ছিল না।

অবশেষে হেমচন্দ্রের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল ফলিল। তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২৫৲ হিসাবে দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি লাভ করিলেন।

হেমচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই সদালাপী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। সকল সহপাঠীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। শিক্ষকগণের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবনে কখনও অন্যায় আচরণ করেন নাই।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসর প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হইলে হেমচন্দ্র ঐ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন কলেজে একটি বিতর্কসভার প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র প্রভৃতি এই সভায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। হেমচন্দ্রও এই সভায় 'শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত'-বিষয়ক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি এত চমৎকার হইয়াছিল যে, রেভারেণ্ড লঙ্ পুস্তিকাকারে উহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

'বেঙ্গল হরকরা'র তৎকালীন সম্পাদক মিস্টার ফর্ব্‌স্ উচ্চকণ্ঠে এই প্রবন্ধের প্রশংসা করেন এবং যীশুখ্রীষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশের সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

চার

পাঠ্যাবস্থায় বাংলা কাব্যাদি পাঠ করিতে হেমচন্দ্র অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

তিনি নিয়মিতভাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর' পাঠ করিতেন এবং মাঝে মাঝে প্রভাকরের জন্য দুই-একটি কবিতা লিখিতেন।

হেমচন্দ্র কবি ভারতচন্দ্রের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। উৎকৃষ্ট বাংলা কাব্যদি পাইলে হেমচন্দ্র তাহা আগ্রহের সহিত বারংবার পাঠ করিতেন। কাশীরাম ও কৃত্তিবাস হেমচন্দ্র বহুবার পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণবাবু হেমচন্দ্রের একজন বন্ধু ছিলেন। তিনি ছিলেন চলতি ভাষার পক্ষপাতী, কিন্তু হেমচন্দ্র ছিলেন সাধুভাষার পক্ষপাতী।

ভাষা সম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবুর সহিত হেমচন্দ্রের মধ্যে মধ্যে তর্ক হইত।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় হেমচন্দ্র কলেজ পরিত্যাগ করেন। কলেজের ২৫৲ ছাত্রবৃত্তি তুই বৎসরের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। তাহা শীঘ্র বন্ধ হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় তাঁহাকে চাকরির চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

বন্ধু নীলমণি বাবুর সাহায্যে হেমচন্দ্র সৈন্য-সংক্রান্ত হিসাব-বিভাগে মাসিক ৩৫৲ টাকা বেতনে একটি কেরানীর পদ লাভ করিলেন। এই চাকরি পাওয়ায় হেমচন্দ্রের পরিবারবর্গের অর্থকষ্ট কিছুটা দূরীভূত হইল।

সংসারের অভাব দূর করিবার জন্য হেমচন্দ্রকে চাকরি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যালয়-পরিত্যাগের সহিত হেমচন্দ্রের বিদ্যানুরাগ কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। হেমচন্দ্র আজীবন বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় বিদ্যানুশীলন করিতেন। সকল সময়েই তাঁহার হস্তে কোন-না-কোন পুস্তক থাকিত। এমন কি, প্রৌঢ় বয়সে আহারের সময়েও তিনি অনেক সময় পুস্তক খুলিয়া পড়িতে পড়িতে আহার করিতেন। এই জন্য আহারে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইত।

হেমচন্দ্র পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি বি.এ. পরীক্ষা-দানের অধিকারী ছিলেন।

তিনি অবিচলিত উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে অবসরকালে বি.এ. পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকাদি পাঠ করিতে লাগিলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র বি.এ. পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার ফল

বাহির হইলে দেখা গেল, হেমচন্দ্র প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয়বার বি.এ. পরীক্ষা।

তৎকালে প্রচলিত প্রথানুসারে কৈশোরে ছাত্রাবস্থাতেই হেমচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কামিনী দেবী ভবানীপুর-নিবাসী কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতমা দুহিতা। তিনি অশিক্ষিতা ও অল্পবুদ্ধি হইলেও অতিশয় সুন্দরী, সরলা, ধর্ম্ম-পরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন।

বিদ্যাবুদ্ধিতে কামিনী দেবী প্রতিভাশালী হেমচন্দ্রের উপযুক্ত না হইলেও, হৃদয়ের গুণে তিনি উদারহৃদয় স্বামীর সম্পূর্ণ যোগ্যা ছিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহার এই সহধর্ম্মিণীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন :

"কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে ?"

জীবনের মধুর উষায় এই জীবনসঙ্গিনীর হস্তধারণ করিয়াই হেমচন্দ্র অনেক আকাঙ্ক্ষা ও সুখস্বপ্ন লইয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন :

"প্রবেশি সংসারে যবে, কি সুখের কাল !
প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল
যতনে ছড়ান ছিল—জড়ান তাহাতে
কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে !

কিবা নিদ্রা, কি স্বপন, কিবা সে জাগিয়া
সকলি নিরখি' বুক উঠিত নাচিয়া ;
ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়,
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী-লতায়।"

পাঁচ

দরিদ্রের সন্তান সাধারণতঃ সরকারী অফিসে সামান্য চাকরি পাইলেই নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করে, কিন্তু হেমচন্দ্রের প্রকৃতি সে ধরনের ছিল না। দেশের ও সমাজের সেবা করিবার অধিকতর অধিকার-লাভের জন্য তিনি চিরদিন আপনার সম্মুখে এক উচ্চ আদর্শ রাখিয়াছিলেন এবং আজীবন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে আত্মোন্নতি দ্বারা সেই উচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বি.এ. পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইবার পর কেরানীগিরি করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা হেমচন্দ্রের আদৌ ছিল না।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির চেষ্টায় শঙ্কর ঘোষ লেনে 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র হেমচন্দ্র হিসাব বিভাগের চাকরি পরিত্যাগ করিয়া মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে উহার প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

ভবিষ্যতে যে চাকরিতে উন্নতি ও পেন্‌সনের আশা ছিল, হঠাৎ

সেই চাকরি পরিত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্র বে-সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান করেন নাই—এই কথা তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র তাহাতে বিচলিত হন নাই।

কিছুকাল পরে, এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ একে একে অবসর গ্রহণ করিলে, উহার সম্পূর্ণ ভার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর আসিয়া পড়ে এবং উহার নাম পরিবর্তিত করিয়া 'মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন' রাখা হয়।

হেমচন্দ্র অতি দক্ষতার সহিত সুচারুরূপে বিদ্যালয়ের কার্য-পরিচালনা করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রশংসা অর্জন করেন।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ রমাপ্রসাদ রায় তাঁহার পুত্রদ্বয়ের জন্য একজন উত্তম গৃহশিক্ষকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের সুপারিশে হেমচন্দ্র রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রদ্বয়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। বিদ্যালয়ের কার্যের পর অবসর-সময়ে হেমচন্দ্র রমা-প্রসাদের দুই পুত্র হরিমোহন ও প্যারীমোহনকে পড়াইতেন।

হেমচন্দ্র অতিশয় কোমলহৃদয় ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। একদিন বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ পড়িয়া গিয়া হাতে ভয়ানক আঘাত পায়। হেমচন্দ্র তাহা দেখিয়া অতিশয় বিচলিত হন এবং তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহাকে গাড়ী করিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যান। তখন স্বনামধন্য চিকিৎসক সূর্যকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া আশান্বিত হইলেন এবং বালকটিকে শীঘ্র পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি দিতে অনুরোধ করিলেন।

সূর্যকুমার গম্ভীরভাবে বালকটিকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেনঃ "This is an interesting case of compound fracture."

ইহাতে হেমচন্দ্র অত্যন্ত অধীর হইয়া বলিলেনঃ "তোমরা ত বেশ লোক! একজনের যখন প্রাণ যায়, তখন তোমরা interesting case বলিয়া experiment কর!" পরে হেমচন্দ্র প্রায়ই এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া চিকিৎসকগণের হৃদয়ের কঠোরতার জন্য তাঁহাদিগের প্রতি অনুযোগ করিতেন।

সূর্যকুমার সর্বাধিকারীর সহিত হেমচন্দ্রের আবাল্য প্রণয় ছিল। বাল্যকালে সূর্যকুমার হেমচন্দ্রের বাড়ীতে যাইতেন। হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী আঁচলে মুড়ি রাখিতেন এবং দুই বন্ধুতে বসিয়া গল্প করিতে করিতে তাহা খাইতেন।

যখন উভয়ে সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চ সম্মান ও যশোলাভ করিয়াছিলেন, তখনও সূর্যকুমার হেমচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া সময় সময় সেই শৈশবের সুখস্মৃতিবিজড়িত পূর্বকথা স্মরণ করিয়া আনন্দময়ীকে বলিতেনঃ "মা, আপনি আজ আবার আঁচলে মুড়ি লইয়া বসুন, আমরা আবার দেখি,—ছেলেবেলার মত দুইজনে আপনার আঁচল হইতে মুড়ি লইয়া খাই।" হেমচন্দ্রের জননী তাহাই করিতেন, দুই বন্ধু তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কত কথা বলিতে বলিতে এবং কত গল্প করিতে করিতে তাহা খাইতেন।

ছয়

যখন হেমচন্দ্র রমাপ্রসাদের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, তখন রমাপ্রসাদ উকিলদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমাজে তাঁহার

অসীম প্রতিষ্ঠা। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়াই হেমচন্দ্র আইন-অধ্যয়নে উৎসুক হন। তিনি তাঁহার স্বল্প অবসরকাল আইন-অধ্যয়নে ব্যয় করিতে লাগিলেন।

খিদিরপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকতা, রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রদ্বয়কে শিক্ষাদান এবং নিজের আইন অধ্যয়ন— এতগুলি কার্য সম্পাদন করিতে অসুবিধা হয় বলিয়া এই সময় হেমচন্দ্র কিছুকাল চাঁপাতলার একটি মেসে অবস্থান করেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষা দেন। কিন্তু অবসরের অল্পতাবশতঃ পাঠে তিনি তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া বি. এল. পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। পরীক্ষক তাঁহাকে এল. এল. উপাধি-লাভের যোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেম।

হেমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। অধ্যক্ষ সাটক্লিফ সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হেমচন্দ্র বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি পরীক্ষককে হেমচন্দ্রের কাগজ পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন এবং হেমচন্দ্রকে সেই পত্রখানা লইয়া যাইতে বলিলেন।

হেমচন্দ্র কৌতূহলবশতঃ লেফাফা হইতে পত্রখানা খুলিয়া পড়িলেন। পত্র খুলিবার সময় লেফাফাখানা ছিঁড়িয়া গেল। সেই ছিন্ন লেফাফাখানা লইয়া পরীক্ষকের নিকটে যাওয়া সঙ্গত নহে মনে করিয়া হেমচন্দ্র আর সেই পত্রখানা পরীক্ষকের নিকট লইয়া গেলেন না।

সেইবৎসর আটজন ছাত্র বি. এল. উপাধি লাভ করেন, কেবল মাত্র হেমচন্দ্র এল. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষিত হন।

১৮৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নূতন নিয়ম হয় যে, এল. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে-সকল ছাত্র গ্রাজুয়েট হইয়াছেন, তাঁহারা ৩০৲ ফী দিলেই বি. এল. উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। এই নিয়ম অনুসারে হেমচন্দ্র ৩০৲ ফী দিয়া বি. এল. উপাধি লাভ করেন।

হেমচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণের নিকট বলিতেন: "কেবল ত্রিশ টাকা দিয়া আমি বি. এল. হইয়াছি, পরীক্ষা দিয়া বি. এল. হই নাই।

বি. এল. উপাধি লাভ করিয়া হেমচন্দ্র শিক্ষকের কার্য পরিত্যাগ করেন।

হেমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, সুতরাং গভর্নমেণ্টের বিচার-বিভাগে কর্ম পাইতে তাঁহাকে অধিক বেগ পাইতে হয় নাই। তিনি প্রথমে শ্রীরামপুরে এবং পরে হাওড়ায় একশত টাকা মাসিক বেতনে প্রতিনিধি-মুনসেফ-রূপে নিযুক্ত হইলেন।

হেমচন্দ্র বেশী দিন মুনসেফি করেন নাই। কেন যে তিনি কর্ম পরিত্যাগ করেন, সে সম্বন্ধে দুইটি কারণ শুনা যায়। একবার কোন মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিবার পূর্বে হেমচন্দ্র তাঁহার পিতার নিকট সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে পান। তাহাতে তাঁহাকে রায় প্রকাশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে, উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে অথবা উকিলদের কৌশলে অনেক সময় সত্যনির্ধারণ দুষ্কর হইয়া উঠে। এই জন্যই তিনি মুনসেফি পরিত্যাগ করিয়া ওকালতি করিতে মনস্থ করেন।

কেহ কেহ বলেন, সুদূর প্রবাসে সন্তানকে যাইতে দিতে তাঁহার

স্নেহময়ী জননী আপত্তি প্রকাশ করায় মাতৃভক্ত হেমচন্দ্র চাকরি পরিত্যাগ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তারিখে হেমচন্দ্র কলিকাতা হাই-কোর্টে উকিল-শ্রেণীভুক্ত হন এবং ইহার কিছুদিন পরেই ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন।

হাইকোর্টে প্রবেশ করিবামাত্রই কাহারও পসার-প্রতিপত্তি হয় না, সকলকেই কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হয়। হেমচন্দ্র চাকরি পরিত্যাগ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করায় কিঞ্চিৎ অর্থকষ্টে পতিত হন।

এই সময় হেমচন্দ্র একটি কার্যের ভার প্রাপ্ত হন। ইহাতে তাঁহার আর্থিক কষ্ট কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হয়। গভর্নমেণ্ট এই সময় 'Norton's Law of Evidence' নামক ইংরেজী আইনের পুস্তকখানা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিবার ভার হেমচন্দ্রকে প্রদান করেন। ইহার পারিশ্রমিকস্বরূপ হেমচন্দ্র তুই হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। সুতরাং হেমচন্দ্রকে চাকরি পরিত্যাগ করিয়া একেবারে আয়শূন্য হইতে হয় নাই।

সাত

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হেমচন্দ্র বাংলা কাব্যসাহিত্যের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বয়ং কবিতাদি রচনা করিতেন।

হেমচন্দ্রের বাল্যসুহৃদ শ্রীশচন্দ্র বিশেষ কোনও কারণে আত্ম-হত্যা করেন। শৈশবের বন্ধুর এই আকস্মিক মৃত্যুতে হেমচন্দ্র অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। এই শোকের প্রাবল্যেই তাঁহার প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' লিখিত হয়।

তৎকালে বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থের অভাব ছিল। সুতরাং হেমচন্দ্রের এই 'চিন্তাতরঙ্গিণী' পাঠক-সমাজে বিশেষ আদর লাভ করিল।

সে-সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠযোগ্য নির্দোষ কাব্যের বড়ই অভাব ছিল। আচার্য কৃষ্ণকমল তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, তিনি হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী' কলেজের ছাত্রদিগের পাঠ্য হওয়ার উপযোগী বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হেমচন্দ্রের শিক্ষাগুরু কাউয়েলও এই পুস্তকের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। উভয়ের চেষ্টায় 'চিন্তাতরঙ্গিণী' ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এ.-পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচিত হয়।

'চিন্তাতরঙ্গিণী'তে ভারতচন্দ্র ও কাশীরামের প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। বাল্যরচনা-সুলভ দোষাদি বর্তমান থাকিলেও উহার স্থানে স্থানে এমন কতকগুলি উচ্চ ভাব আছে যে, তাহা বাংলার সুভাষিত-সংগ্রহে চিরদিন স্থান পাইবার যোগ্য।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনই এই পুস্তকের দোষ-গুণ লইয়া যেরূপ আলোচনা হইয়াছিল, সেরূপ আলোচনা আর কোনও বাংলা পুস্তকেরই হয় নাই। নূতনত্বের বিরোধী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ উহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের সমালোচনার শাণিত অস্ত্রসমূহ প্রবল ধারায় নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের নূতনত্বের জন্য উহা বিক্রয় হইয়াছিল। মধুসূদনের সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতির চেষ্টায় উহা কোন কোন বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হইয়াছিল। সেইজন্য

এক বৎসরের মধ্যে প্রথম সংস্করণের একহাজার পুস্তক নিঃশেষ হইয়া পুস্তকের দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হইয়াছিল।'

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বুঝিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী করিবার জন্য এবং বিপক্ষীয়গণকে কাব্যসৌন্দর্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের সংস্কার দূরীভূত করিবার জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ-মুদ্রাঙ্কনকালে 'মেঘনাদবধ'-এর বিস্তৃত টীকা ও সমালোচনা-সংবলিত ভূমিকা সংযোজন করিবার প্রয়োজন হয়।

হেমচন্দ্র তখন একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া অপর একখানি কাব্য-রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম অনুরাগী বলিয়া তিনি বন্ধুসমাজে পরিচিত ছিলেন।

একদিন হেমচন্দ্রের সহিত মধুসূদনের আলাপ হয়। মধুসূদন হেমচন্দ্রকেই উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া তাঁহাকেই 'মেঘনাদবধ'-এর টীকা ও ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলে হেমচন্দ্র 'মেঘনাদবধ'-এর বিস্তৃত টীকা এবং ভূমিকা লিখিয়া দেন।

হেমচন্দ্র-লিখিত ভূমিকায় নিরপেক্ষ ও স্বাভাবিক বিচারশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একদিকে মধুসূদনের কবিত্ব-শক্তির দুই প্রধান গুণ ওজস্বিতা ও সৃজনী শক্তির যেরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, অন্যদিকে মধুসূদনের কাব্যের দোষগুলিও প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি মধুসূদনের কাব্যের প্রধান প্রধান দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

প্রথমবার হেমচন্দ্র যে-ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, পরে তাহার অনেক পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এই পরিবর্তিত ভূমিকাটি 'মেঘনাদ-বধ'-এর প্রচলিত সংস্করণগুলিতে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।

মোটের উপর, হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, সমস্ত দোষ সত্ত্বেও অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় যে ইহার তুল্য কাব্য রচিত হয় নাই, ইহা মুক্ত-কণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

হেমচন্দ্রের এই নিরপেক্ষ সমালোচনা পাঠ করিয়া কবি মধুসূদন স্বয়ং বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।

সেকালে 'মেঘনাদবধ' জনসাধারণ বা পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক তেমন ভাবে সমাদৃত হয় নাই। হেমচন্দ্র 'মেঘনাদবধ'-সমালোচনায় কাব্যের যে-উচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহার জন্যও তাঁহাকে নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল। হেমচন্দ্র এই অযথা নিন্দায় ব্যথিত হইলেও স্বীয় নির্ভীক অভিমত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ **'বীরবাহু কাব্য'** প্রকাশিত হয়।

'বীরবাহু কাব্য'-এর উপাখ্যান-ভাগ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ইহা কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। পুরাকালে হিন্দুবীরগণ স্বদেশরক্ষার জন্য কিপ্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কাহিনীটি রচনা করা হইয়াছে।

'বীরবাহু কাব্য'-এর উপাখ্যান-ভাগ সংক্ষেপে এইরূপ :

গ্রীষ্মকালের এক সুন্দর প্রভাতে গ্রন্থের নায়ক কান্যকুব্জের যুবরাজ বীরবাহু তাঁহার পিতা মহারাজ রণবীরের নিকট উপবনে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাওয়া গেলে বীরবাহু তাঁহার পত্নী হেমলতার নিকট গিয়া উপবনবাসের প্রস্তাব করিলেন। হেমলতা এই প্রস্তাবে অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

উভয়ে উপবনে গিয়া আমোদ-আহ্লাদে মত্ত, এমন সময়ে যোগিনী-

বেশ-ধারিণী এক রমণী ঘাটের উপর আসিয়া দেখা দিলেন। যোগিনী পরিচয় দিলেন যে, তিনি এক রাজকন্যা, স্বয়ংবরসভায় অম্বর-রাজকে পতিত্বে বরণ করিয়া পতিগৃহে যাইবার সময় যবনের হস্তে নিপতিত হন। যবনেরা তাঁহার স্বামীকে নিহত করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে। তিনি কৌশলে নিজকে কারামুক্ত করিয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বর্তমানে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

যোগিনী ওজস্বিনী ভাষায় দেশের দুর্দশা বর্ণনা করিয়া যুবরাজ বীরবাহুকে তিরস্কার করিলেন :

"ভারতে কনোজ ধাম, প্রসিদ্ধ পবিত্র নাম,
তুমি সেই কনোজের বংশধর হইয়া।
এইভাবে অকারণে, বৃথা কাল বনে বনে,
অপচয় করিতেছ রামাগণে লইয়া॥"

যোগিনীর উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে যুবরাজ বীরবাহুর হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল :

"দুর্জয় কোপ জ্বলিয়া উঠিল।
ঘন দেহ চমকিয়া উঠিতে লাগিল॥
অন্তরের কোপ তবে অন্তরে চাপিয়া।
থাকিয়া থাকিয়া বীর উঠিল কাঁপিয়া॥
যেন গগনের দর্প, বায়ুর নিঃস্বন।
শুনি' ধরা ক্রোধভরে করয়ে কম্পন॥
কিংবা যেন ঘোর মেঘ সাগরগর্জনে।
জানায় আপন দর্প ডাকিয়া সঘনে॥"

অনন্তর বীরবাহু পিতার নিকট গমন করিয়া কনোজ-অভিমুখী

যবন-সৈন্য বিধ্বস্ত করিবার অনুমতি চাহিলেন। তিনি পিতাকে বুঝাইলেন, "বীর্য যার, ধরা তার, বিধির নির্ণয়।"

যবনের সহিত যুদ্ধে বীরবাহু আহত ও অচেতন হইলেন এবং যুবরাজ-পত্নী শত্রু-হস্তগতা হইলেন।

যবনরাজ হেমলতার ধর্মনাশ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু অপর এক হিন্দুরাজকন্যা, যাঁহার সতীত্ব পূর্বে যবনরাজ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল, হেমলতার দুঃখে কাতর হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন : "দিয়াছি আমার ধর্ম, তোমার রাখিব।"

ইঁহার কৌশলে যবনরাজ প্রতারিত হইল।

এদিকে বীরবাহু চেতনা লাভ করিয়া অসহ্য শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন, যেরূপেই হউক "প্রমদার বিমোচন, যবনকুল-নিধন, অদ্যাবধি এই মম পণ।"

অতঃপর বীরবাহু শ্বশুর কলিঙ্গরাজের নিকট হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যবনদিগের বিরুদ্ধে জলপথে যাত্রা করিলেন।

তখন সমুদ্রে সহসা ঝড় উঠিল :

"বায়ুকোণে দিল দেখা কালিম জলদরেখা,
ঢাকিল রবির কর নভোদেশ ব্যাপি'।
গর্জিল জলদজাল, যেন প্রলয়ের কাল,
সহস্র কেশরিনাদে জলদল নাদিল॥
মাতিল তরঙ্গকুল, হুল হুল কুল কুল,
ডাক ছাড়ি' লম্ফ দিয়া শূন্যমার্গে উঠিল।
প্রলয়-পবন হাঁকে, স্তব্ধ বসুমতী কাঁপে,
তরু-লতা-গুল্ম লয়ে দিগন্তরে ছুটিল॥

বজ্রের চিচ্চিড় ধ্বনি, বাতাসের হুন্ হুনি,
সমুদ্র-মেঘের নাদে ত্রিভুবন চমকে।
প্লাবন করিতে সৃষ্টি, উল্কাপাত, শিলাবৃষ্টি,
অবিচ্ছেদ মুষলের ধারা বর্ষে ঝমকে॥
দশদিক অন্ধকার, শূন্য জল একাকার,
হুই হুই রব মাত্র শুনা যায় শ্রবণে।
চমকে চিকুররেখা, তার মাঝে যায় দেখা
জলধিতরঙ্গ-রঙ্গ চমকিত নয়নে॥
পর্বত করিয়া তুচ্ছ, উথলে হিল্লোল উচ্চ,
হুলুস্থুল চারিকূল ব্রহ্মাণ্ড ফুটিছে।
দনুজ সহস্রজন করি' ভীম গরজন,
আকাশমণ্ডল যেন হাতে হাতে লুফিছে॥
অথবা অনন্ত যেন প্রসারি' সহস্র ফণ,
তারা-সূর্য-গ্রহগণে ধরি' ধরি' গিলিছে।
কিংবা যেন দেব-দৈত্য অমৃত লভিতে মত্ত,
পুনর্বার বরুণের রাজ্য ছার করিছে॥
দেবকীর্তি ভয়ঙ্কর, পৃথিবী সহে না ভর,
কি করিবে তার মাঝে মানুষের সামর্থ্য।
যত তরী দলবল, সব গেল রসাতল,
দৈব বল বাদী হয়ে পাড়ে ঘোর অনর্থ॥"

বীরবাহু কোনমতে প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহার দুঃখের সীমা নাই। তিনি উদাসীর ন্যায় যেদিকে দুই চক্ষু যায়, সেই দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে হঠাৎ ছয়জন দেবকন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা শাপগ্রস্তা বরুণ-কন্যা। কোনও বিপদ হইতে ইঁহাদিগকে রক্ষা করায় ইঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া বীরবাহুকে আশীর্বাদ করিলেন এবং অলৌকিক উপায়ে যবন-রাজধানীতে নির্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিলেন।

বীরবাহু যবনরাজকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া অপর হিন্দু-রাজন্যবর্গের সাহায্যে যবনকুল বিনষ্ট করিয়া সহধর্মিণীর উদ্ধার-সাধন ও দিল্লীর রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন।

আট

হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করার কিছুদিন পরেই হেমচন্দ্রের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রমাপ্রসাদ রায় পরলোকগমন করেন। হাইকোর্টে কোনও শক্তিশালী ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা না করিলে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে শীঘ্র উন্নতিলাভ করা সম্ভব নহে। রমাপ্রসাদের অকালমৃত্যুর পর হেমচন্দ্র হাইকোর্টে উন্নতির আশা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া বরিশালে ওকালতি করিতে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু এই সময়ে একটি আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিতপূর্ব ঘটনায় তাঁহার সঙ্কল্পের পরিবর্তন ঘটে।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় মিস্টার অ্যালেন নামক একজন উকিলের জুনিয়রি করিতেন। একটা মোকদ্দমায় একদিন ঘটনাক্রমে অ্যালেন নিজে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, সুতরাং হেমচন্দ্রকেই মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় পরিচালনা করিতে হয়। হেমচন্দ্র এমন সুন্দরভাবে মোকদ্দমা পরিচালনা করিলেন যে, মোকদ্দমায় তাঁহারই

জয় হইল। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে তাঁহার পসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার আর বরিশালে যাওয়া হইল না। ক্রমে তাঁহার যথেষ্ট উপার্জন হইতে লাগিল। মাসে তিনি দুই হাজার-আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করিতে লাগিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই হেমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভাগুণে কি বিচারপতি, কি সহকর্মী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন।

হাইকোর্টে ওকালতিতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্রের যশঃ-পুষ্পের সৌরভ কাব্যজগতেও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল।

হেমচন্দ্রের এই দ্রুত উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার সহপাঠীরাও বিস্মিত হইয়াছিলেন। তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে হেমচন্দ্রের এইরূপ অভাবনীয় উন্নতি দেখিয়া তারাপ্রসাদ ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পরিত্যাগ করিয়া ওকালতি করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের সর্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতি সদাশয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত পরলোকগমন করেন। শম্ভুনাথ অতিশয় ন্যায়পরায়ণ, সুপণ্ডিত, স্বাধীনহৃদয় ও বহুদর্শী বিচারপতি ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে কেবল হেমচন্দ্র নহেন, হাইকোর্টের সমস্ত উকিল ও বিচারপতি এবং হাইকোর্টের বাহিরের সমস্ত শিক্ষিত সমাজ গভীর শোকে আছন্ন হইয়াছিলেন।

শম্ভুনাথের মৃত্যুর পর দেশের কোন্ ব্যক্তি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইবেন, তাহা লইয়া সমস্যা উপস্থিত হয়। অবশেষে

দ্বারকানাথ মিত্র বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। এই নিয়োগে হেমচন্দ্র সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হইলেন।

দ্বারকানাথের নিয়োগ-বার্তা প্রচারিত হইবামাত্র হেমচন্দ্র তাঁহার সহযোগিগণের সহিত তাঁহার নিকট আনন্দ প্রকাশ করিতে গেলেন। দ্বারকানাথ দেখিতে ছিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। দ্বারকানাথকে লক্ষ্য করিয়া হেমচন্দ্র তাঁহার সহযোগিগণকে বলিলেনঃ "দোয়ারি যে অন্ধকার-কালো, ওকে জজ হিসাবে মানাবে না।" দ্বারকানাথ ইহার উত্তরে সহাস্য বদনে বলিলেনঃ "এই ত ঠিক, শম্ভুনাথবাবু সাহেবের মত ফরসা ছিলেন, তিনি সাহেব কি ভারতীয়, হঠাৎ স্থির করা যেত না। এখন কোর্টে ঢুকলেই লোকে দেখবে, কালো নেটিভ জজ-আদালত অন্ধকার করে বসে রয়েছে, খুঁজে নিতে কষ্ট পেতে হবে না।"

নয়

এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে, নব্য বাঙ্গালী-সমাজে জগদ্বিখ্যাত কবি শেক্সপীয়রের পাঠক ও ভক্তের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আর কোনও বিদেশীয় কবি সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই।

বহু ভাষায় শেক্সপীয়রের গ্রন্থরাজি অনূদিত হইয়া সেই সেই ভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছে। বাংলা ভাষায়ও উহা অনুদিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র চিরদিনই শেক্সপীয়রের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' নামক প্রসিদ্ধ নাটকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অতি অল্পকালমধ্যেই তাঁহার **'নলিনী-বসন্ত'** প্রকাশিত হইল (সেপ্টেম্বর, ১৮৬৮ খ্রীঃ)।

'টেম্পেস্ট'-এর অবিকল অনুবাদ না হইলেও 'নলিনী-বসন্তে' সেই জগদ্বিখ্যাত কাব্যের উচ্চভাব ও মধুর রস অতি নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি কি সুন্দর!—

"দিবা হলো অবসান, ডুবিছে মিহির,
যামিনী আনিতে ধীরে চলিছে সমীর।
মেঘের বরণ জল সাগরেতে শতদল,
একি কামিনীর ছল, গ্রাসে করিবর!
পত্র 'পরে চারিধারে সখীগণ নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তলপাশ, অধরে মধুর হাস,
পবনে উড়ায় বাস ভুলাতে ভ্রমর।
এসো কে দেখিতে যাবে, এ মায়া ফুরায়ে যাবে,
এখনি ডুবিবে ভানু, আসিবে তিমির।
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।"

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী যখন 'অবোধ-বন্ধু' নামক মাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদকতা করিতেছিলেন, তখন তিনি হেমচন্দ্রকে ঐ পত্রিকায় লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলে হেমচন্দ্র 'ইন্দ্রের সুধাপান' রচনা করেন। ইহা ১২৭৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি ড্রাইডেনের 'Alexander's Feast' নামক বিখ্যাত কবিতার অনুকরণে লিখিত।

হেমচন্দ্রের রচনার আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে, তিনি তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট রচনাসমূহ প্রকাশ করিবার সময়েও একটা সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। যখন তিনি বাংলা ভাষায় তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা

করেন, তখনও তাঁহার এই সঙ্কোচের ভাব দূর হয় নাই। এই বিষয়ে তাঁহার প্রকৃতি মধুসূদন, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের প্রকৃতির ঠিক বিপরীত ছিল। তাঁহার সঙ্কোচের ভাব লক্ষ্য করিয়া পরিহাসরসিক বন্ধুগণ প্রায়ই হেমচন্দ্রের সহিত পরিহাস করিতেন

নয়

দরিদ্রের সন্তান হেমচন্দ্র স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে যখন সমাজে ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চতর সম্মান ও সুখলাভের আশায় উৎফুল্ল, তখন সহসা এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাঁহার পিতা কৈলাসচন্দ্রের স্বাস্থ্য পূর্বেই ভগ্ন হইয়াছিল। তিনি সকলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। পিতার মৃত্যুতে হেমচন্দ্র হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। তিনি কিছুকাল কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করিলেন। তিনি গয়ায় তাঁহার পিতৃদেবের তর্পণাদি করিয়া কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন এই সময়ে দেশময় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিও যে অপরাপর সাধারণ হিন্দুর ন্যায় 'কুসংস্কার' পরিত্যাগ না করিয়া গয়ায় পিতৃতর্পণ করিলেন, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি হেমচন্দ্রের ব্যবহারে তাঁহার অসন্তোষ প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিলেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন না করিয়া 'কুসংস্কারপূর্ণ' হিন্দু-আচারাদি পালন করিয়া যে নিজ নিজ বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য করিতেছেন, এইরূপ ইঙ্গিতও করিলেন।

প্রত্যুত্তরে হেমচন্দ্র ‘Brahmo Theism in India’-শীর্ষক একটি ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা করেন এবং উহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতবাদ ও উপদেশাবলী পরীক্ষা করিয়া, কিজন্য শিক্ষিত ভারতবাসী ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিবেন না, তাহা নির্দেশ করিয়া দেন। এই প্রবন্ধটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় যখন ‘এডুকেশন গেজেট’-এর সম্পাদক, তখন হেমচন্দ্রের কতকগুলি কবিতা পর পর তাহাতে প্রকাশিত হয়।

হেমচন্দ্রের বিখ্যাত কবিতা ‘ভারত-বিলাপ’ এবং ‘ভারত-সঙ্গীত’ ‘এডুকেশন গেজেটে’ প্রকাশিত হয়। ‘ভারত-সঙ্গীত’-রচনা সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। রচনার পূর্বে কয়েকদিন ধরিয়া হেমচন্দ্রের বন্ধুগণ লক্ষ্য করিলেন, হেমচন্দ্র অতিশয় বিষন্ন এবং অন্যমনস্ক। বিষণ্ণতার কারণ কি, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। বাহিরে প্রকৃতিদেবীর অবস্থাও হেমচন্দ্রের হৃদয়ের অনুরূপ। কয়দিন ধরিয়া আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, বায়ু বহিতেছে না, চারিদিক যেন স্তব্ধ। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল, আকাশ হইতে বৃষ্টির ধারা নামিয়া আসিয়া তপ্ত পৃথিবীকে সুশীতল ও স্নিগ্ধ করিল। হেমচন্দ্রের বিষাদের ভাবও অকস্মাৎ বিদূরিত হইল, তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল, তিনি কাগজ-পেন্‌সিল লইয়া এক আসনে বসিয়াই সমগ্র ‘ভারত-সঙ্গীত’ কবিতাটি লিখিয়া ফেলিলেন।

‘এডুকেশন গেজেটে’ ‘ভারত-সঙ্গীত’ প্রকাশিত হইলে দেশময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এই একটি কবিতা দ্বারাই হেমচন্দ্র সাহিত্য-জগতে তাঁহার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র যদি আর কিছু না লিখিয়া কেবল 'ভারত-সংগীত' বা 'ভারত-বিলাপ' লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি একজন অসাধারণ কবি বলিয়া কবিগণের মধ্যে যে উচ্চস্থান পাইতেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা বাংলা ভাষাকে দুর্বল ও নিস্তেজ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন,—যাঁহাদের ধারণা ছিল যে, বাংলা ভাষায় হৃদয়ভেদী ও জ্বালাময়ী কবিতা লেখা যাইতে পারে না, তাঁহাদের হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' ও 'ভারত-বিলাপ' পড়িয়া সে-ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে।

'ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটি স্বদেশপ্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া তোলে এবং তুরীধ্বনির ন্যায় হৃদয়কে উত্তেজিত করে ঃ

"যাও সিন্ধুতীরে, ভূধরে শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে,
স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হও!"

প্রভৃতি পদগুলি হৃদয়কে অভূতপূর্বভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে।

দশ

যখন 'এডুকেশন গেজেটে' হেমচন্দ্রের কবিতাবলী প্রকাশিত হইতেছিল, তখন বাঙ্গালী পাঠকগণ অসীম আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিতেছিলেন। যাঁহারা 'এডুকেশন গেজেটে'র গ্রাহক ছিলেন না, তাঁহারাও হেমচন্দ্রের কবিতা অন্যের নিকট হইতে নকল করাইয়া আনিয়া পাঠ করিতেন এবং কণ্ঠস্থ করিতেন।

'ভারত-বিলাপ' ও 'ভারত-সঙ্গীত' প্রকাশিত হইবার পর হেমচন্দ্রের বন্ধুগণ তাঁহার খণ্ড-কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিতাবলী' প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরেই সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গবিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' মাসিকপত্রের প্রবর্তন করেন। প্রথম হইতেই বঙ্গদর্শনের সহিত হেমচন্দ্রের সংযোগ ছিল এবং তিনি 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিতভাবে কবিতা লিখিতেন। যেসকল প্রতিভাশালী লেখক প্রথম হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সদনুষ্ঠানে সহযোগিতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেমচন্দ্র সর্বাগ্রগণ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্রের যে-সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :

১।	কমিনীকুসুম (কবিতা)	বঙ্গদর্শন—	বৈশাখ,	১২৭৯
২।	মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কিসে হয় (প্রবন্ধ)	"	জ্যৈষ্ঠ	"
৩।	দেবনিদ্রা (কবিতা)	"	ভাদ্র	"
৪।	ইন্দ্রালয়ে সরস্বতীপূজা (কবিতা)	"	পৌষ	"
৫।	পরশমণি (কবিতা)	"	মাঘ	"
৬।	অন্নদার শিবপূজা (কবিতা)	"	জ্যৈষ্ঠ,	১২৮০
৭।	(মধুসূদনের) স্বর্গারোহণ (কবিতা)	"	ভাদ্র,	"
৮।	দুর্গোৎসব (কবিতা)	"	আশ্বিন	"
৯।	ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার (কবিতা)	"	চৈত্র	"

১০। কমল-বিলাসী (কবিতা) „ আষাঢ়, ১২৮১
১১। এই কি আমার সেই
জীবনতোষিণী (কবিতা) „ আশ্বিন „
১২। সুহৃৎ-সঙ্গম (কবিতা) „ অগ্রহায়ণ ১২৮২

'পরশমণি' কবি হেমচন্দ্রের একটি বিখ্যাত কবিতা। কবি বিধাতানির্মিত মনুষ্য-চক্ষুকে পরশমণির সহিত তুলনা করিয়াছেন ঃ

"পরশমণির সনে, লৌহ-অঙ্গ-পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদবচন,—
এ মণি-পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহার পরশগুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি' আছে ধরা আলো করি',
মাটির অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ।

অপূর্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন!
স্নেহরূপ কত ফুল ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন!
জননী-বদন-ইন্দু মরি কি করুণাসিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শতশশিরশ্মিমাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা,
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন,

সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র গৃহীর কাঞ্চন।
এই মণি-পরশনে হয় সুখ দরশনে,
মানব-জনম সার সফল জীবন।
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?”

জীবনের প্রভাতকালে যে পরশমণির গুণ-বর্ণনায় কবি আত্মহারা হইয়াছিলেন, জীবনের সন্ধ্যায় কবি সেই পরশমণি হইতে স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া কি অসীম দুঃখই না পাইয়াছিলেন!

এগার

কয়েকজন লেখক ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত রচনার জন্য দক্ষিণা লইয়া গোলমাল করায় বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া চারি বৎসর পরে ‘বঙ্গদর্শন’-প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন।

হেমচন্দ্র কখনও পয়সার জন্য গ্রন্থরচনা করেন নাই। তিনি সকল সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে রচনা ও সৎপরামর্শ দ্বারা সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতেন। এই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের নিকট অশেষ ঋণী ছিলেন।

কিছুদিন পরে ‘বঙ্গদর্শন’-এর আবার আবির্ভাব হইয়াছিল। তখনও হেমচন্দ্র রচনাদি দ্বারা উহাকে দীপ্তিদান করিয়াছিলেন।

যখন দরিদ্রসন্তান হেমচন্দ্রকে দেবী বীণাপাণি তাঁহার অক্ষয় বীণা প্রদান করিয়া যশের হৈম মুকুটে বিভূষিত করিলেন, তখন দেবী কমলাও তাঁহার সপত্নীর বরপুত্রকে সুখৈশ্বর্য দ্বারা মণ্ডিত করিতে বিরত

হন নাই। যখন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার কবি-সিংহাসনে হেমচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার প্রতিভা-উজ্জ্বল ললাটে রাজটিকা প্রদান করিলেন, যখন সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী কবিবর হেমচন্দ্রের সৃষ্ট অপূর্ব কাব্যরাজ্যে প্রবেশ করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, তখন সাহিত্যক্ষেত্র ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহার যশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

হাইকোর্টে তখন হেমচন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিপত্তি। হেমচন্দ্রের পসার-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক গল্প আছে ঃ

কোনও এক মোকদ্দমায় এক পক্ষে রমেশবাবু ও হেমবাবু ছিলেন, অপর পক্ষে উঁহাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর দুইজন উকিল ছিলেন। মোকদ্দমাটি দ্বারকানাথ মিত্র এবং আর একজন বিচারপতির সম্মুখে চলিতেছিল। দ্বিতীয় পক্ষের মোক্তার একদিন অপর পক্ষের মোক্তারকে বলিতেছিলেন ঃ "তুমি ত দুই বাঘা ভাল্‌কো উকিল দিয়াছ, তোমার আর ভাবনা কি ?" এই কথা শুনিয়া রহস্যপ্রিয় হেমবাবু বলিয়া উঠিলেন (রমেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া) ঃ "বাঘাটা ত পালিয়েছে। (আর নিজের প্রতি লক্ষ্য করিরা) ভালুকটা ত (বিচারপতি-রূপে উপবিষ্ট দ্বারকানাথ মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া) সিংহের তাড়ায় অস্থির হইয়াছে।"

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি দ্বারকানাথ মিত্র পরলোক-গমন করেন। তাঁহার স্থলে রমেশচন্দ্র মিত্র বিচারপতি নিযুক্ত হন। রমেশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র একই সময়ে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কর্মক্ষেত্রে উভয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য এক ছিল। হেমচন্দ্র রমেশচন্দ্র অপেক্ষা কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট

ছিলেন না। বরঞ্চ রমেশচন্দ্র অপেক্ষা হেমচন্দ্রের তর্কশক্তি ও বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা বেশী ছিল।

এই সময়ে হেমচন্দ্রকেও বিচারপতি করিবার কথা হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের জননী তাঁহাকে এইপদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। তিনি বলিয়াছিলেনঃ "যে বিচারাসনে বসিবার পূর্বেই রমাপ্রসাদ অকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, পাঁচবৎসর যে বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতে না করিতে শম্ভুনাথ পরলোক গমন করিয়াছেন, সাতবৎসর যে বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতে না করিতে দ্বারকানাথ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান হেমচন্দ্র যেন সে-বিচারাসনে বসিবার ইচ্ছা না করেন।"

বাঙ্গালীর সৌভাগ্য যে, হেমচন্দ্র বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন নাই। কারণ, বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হইলে হয়ত আমরা হেমচন্দ্রের সৃষ্ট অতুলনীয় মহাকাব্য 'বৃত্রসংহার'-এর রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতাম।

রমেশচন্দ্রের নিয়োগে উদারহৃদয় হেমচন্দ্র অতিমাত্র আনন্দিত হইয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার গভীর প্রণয় চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষের ছায়াও কখন তাঁহার নির্মল হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

হেমচন্দ্র স্বয়ং বিচারপতির পদলাভ অপেক্ষা স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন পছন্দ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার আয়ও সামান্য ছিল না।

বিপুল অর্থ উপার্জন করিলে সমাজে প্রতিপত্তি হয়। অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য থাকিলেও সমাজে অতুলনীয় প্রতিপত্তি হয়। হেমচন্দ্রেরও সমাজে অসাধারণ প্রতিপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ,

তিনি একদিন যেমন বিপুল অর্থ উপার্জন করিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু কেবল অর্থের জন্য, কেবল প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন নাই। তিনি তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব, স্বভাবের মাধুর্য, মিষ্টভাষিতা, উদারতা ও পরহিতৈষণার জন্য সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন।

তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন সত্য, কিন্তু সে অর্থের অধিকাংশই পরার্থে ব্যয়িত হইত।

হেমচন্দ্র দীনে মুক্তহস্ত এবং দরিদ্রসেবায় অপরাঙ্মুখ ছিলেন। তিনি গোপনে দান ও পরোপকার করিতে ভালবাসিতেন, প্রশংসালাভের জন্য কখনও সমুৎসুক ছিলেন না। তাঁহার সৎকার্যসমূহ নীরবে লোকের অগোচরে সম্পন্ন হইত।

যখন মহামহোপাধ্যায় নীলনণি মুখোপাধ্যায়ের পিতৃবিয়োগ ঘটে, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ, পিতৃশ্রাদ্ধাদির জন্য হেমচন্দ্রের জনৈক বন্ধু তাঁহাকে নীলমণিবাবুকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন। হেমচন্দ্র পরের দিনই তাঁহার নিকট অনেকগুলি টাকা দিয়া আসেন। সেই টাকার অধিকাংশই যে হেমচন্দ্রের নিজ তহবিল হইতে প্রদত্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রহস্যপ্রিয় হেমচন্দ্র সভায় আসর জমাইতে অত্যন্ত পটু ছিলেন। তিনি সভায় হাসির তুফান তুলিতে পারিতেন।

তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী ও সদ্বক্তা ছিলেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনে এত সুখে সময় কাটিয়া যাইত যে, লোকে জানিতে পারিত না, কত সময় কাটিয়া গেল। পূজার ছুটি হইলে হাইকোর্টে

কেবল ভেকেশন বেঞ্চ বসিত। সেই সময়ে হেমচন্দ্র এক-আধদিন হাইকোর্টে বেড়াইতে আসিতেন এবং সেই সময়ে গল্প করিতে ভালবাসিতেন। এক-এক দিনের বৈঠকে বেলা ১১টা হইতে ৩টা পর্যন্ত উকিলদের লাইব্রেরিতে তাঁহার গল্প চলিত। যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গল্প শুনিতেন।

এই-সকল গুণেই হেমচন্দ্র সমাজে অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কোথাও কবির গান হইলে হেমচন্দ্রই বিচারকের আসন গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইতেন। হেমচন্দ্র কোনও পক্ষকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া গৌরব প্রদান করিলে প্রতিপক্ষের তাহাতে ক্ষোভের কারণ থাকিত না।

কি সাহিত্যজগতে, কি কর্মক্ষেত্রে, কি স্বজাতিসমাজে সর্বত্রই হেমচন্দ্রের এই সময়ে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি।

সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয়েরই প্রসন্ন দৃষ্টি সেই প্রতিভা-উজ্জ্বল আননে পতিত হইয়াছে।

দরিদ্রের সন্তান হেমচন্দ্রকে কমলা একদিকে তাঁহার স্বর্ণভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অপরদিকে বীণাপাণি চিরস্থায়ী কীর্তি ও শুভ্রযশের মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বারো

হেমচন্দ্র যে মহাকাব্য রচনা করিয়া মহাকবির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার নাম **'বৃত্রসংহার'**। ইহার প্রথমখণ্ড ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়।

'বৃত্রসংহার'-এর পটভূমিকা মহাভারতের অন্তর্গত বনপর্বে বিবৃত

ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধের উপাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। হেমচন্দ্র এই পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই, অনেক স্থলেই নিজ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াছেন। তিনি মহাভারত-বর্ণিত অতি সংক্ষিপ্ত বৃত্রবধের বিবরণকে ভিত্তি করিয়া স্বীয় অপূর্ব কল্পনা-বলে তদুপরি এই 'বৃত্রসংহার' কাব্যরূপ বিশাল প্রাসাদ রচনা করিয়াছেন।

প্রথমখণ্ড 'বৃত্রসংহার' একাদশ সর্গে সমাপ্ত। প্রথমসর্গের, প্রথম দৃশ্য পাতাল। স্বর্গের অধোদেশে মর্ত, তাহার অধোদেশে অতল গভীর সমুদ্র, তাহার নিম্নে অন্ধতম পাতালপুরী। সেই পাতাল-পুরীতে নির্বাসিত দেবগণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত। পাতালের সে-দৃশ্য কী ভয়ানক এবং স্বর্গচ্যুত হৃতজ্যোতি দেবগণের অবস্থাও কি ভয়ঙ্কর !

"বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,—
নিস্তব্ধ বিমর্ষভাব চিন্তিত আকুল ;
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘডম্বরে যথা অমানিশি।

যোজন সহস্রকোটি পরিধি বিস্তার—
বিস্তৃত সে-রসতল বিধূনিত সদা ;
চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর,
সিন্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত।

বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ-আচ্ছাদিত,
মলিন নির্বাণ-প্রায় কলেবরজ্যোতি ;
মলিন নির্বাণ যথা সূর্য তিষাম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে।"

স্বর্গচ্যুত দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্ন ভীষণ শব্দ-পূর্ণ সভাতলে বসিয়া স্বর্গোদ্ধারের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তিনি কুমেরুশিখরে নিয়তি দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন। সর্বপ্রথমে সভায় দেবসেনাপতি কার্তিকেয় গম্ভীর মেঘমন্দ্রে বক্তৃতা করিলেন। সেই অগ্নিময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া দেবগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর সভায় অগ্নিদেব, প্রচেতা, সূর্যদেব জ্বলন্ত ভাষায় স্বর্গোদ্ধারের জন্য বক্তৃতা করিলেন। সূর্যদেব বলিলেন ঃ

"মম ইচ্ছা পুরবৃন্দ দুরন্ত আহবে
দহ হে দানবকুল, ভীম উগ্র তেজে,
যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর
জ্বলুক গগনব্যাপী অনন্ত সমর।"

সূর্যদেবের এই প্রস্তাব দেবগণ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিলেন। দেবগণ ইন্দ্র ছাড়াই যুদ্ধযাত্রায় সম্মত হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ। দৃশ্য ইন্দ্রালয়ের নন্দনকানন।

নন্দনবনে বৃত্রমহিষী ঐন্দ্রিলা নবপ্রাপ্ত স্বর্গসুখে সুখময়ী ঃ

"রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,'
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,'
বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।"

তিনি স্বর্গের অধীশ্বরী হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার সাধ মিটিতেছে না। তিনি রতির নিকট ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর কথা শ্রবণ করিয়াছেন ঃ

"শুনেছি না কি সে পরমা রূপসী,
বড় গরবিনী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে।"

তিনি বৃত্রের নিকট আবদার ধরিলেন শচীকে তাঁহার দাসী করিয়া দিতে হইবে।

বৃত্র স্ত্রীর কথায় মোহপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার বীরত্বের গৌরব ভুলিলেন, ধর্ম ভুলিলেন, ইন্দ্রাণীকে নৈমিষারণ্য হইতে আনয়ন করিয়া দানবরাণীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন। পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইল। যে-অপূর্ব তপস্যার বলে বৃত্র স্বর্গজয়ী হইয়াছিলেন, তাহার ফল নষ্ট হইতে চলিল।

তৃতীয় সর্গ। বৃত্রাসুর সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। বৃত্রের আদেশ অনুসারে মদন শচীর সন্ধান তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। শচী একমাত্র সঙ্গিনী বিদ্যুৎকে লইয়া নৈমিষারণ্যে বিচরণ করিতেছেন। বৃত্র সভায় উপবেশন করিয়া আদেশ করিলেন, ভীষণ নামক মহাপরাক্রান্ত অসুর শচীদেবীকে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হউক।

সভাভঙ্গের পূর্বে মন্ত্রী সংবাদ দিলেন যে, সূর্য প্রভৃতি দেবগণ স্বর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। তাহা শুনিয়া অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

চতুর্থ সর্গ। দৃশ্য নৈমিষারণ্য। এই সর্গে শচীদেবী সখী বিদ্যুতের নিকট স্বর্গচ্যুতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

মদন প্রভু বৃত্রকে শচীদেবীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি শচীর নিকট বিশ্বাসঘাতক নহেন। শচীদেবীকে ধৃত

করিয়া আনিবার ব্যবস্থার কথা শুনিয়া তিনি অবিলম্বে শচীদেবীকে সংবাদ দিতে নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন।

মদনদেব শচীদেবীকে বৃত্রের অভিসন্ধির কথা বলিয়া দিলেন। শচী এই সংবাদে স্তম্ভিত হইলেন, পরে রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইন্দ্রের অভাবে পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গ। জয়ন্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া সখী বিদ্যুৎ শচীকে বৈকুণ্ঠে বা কৈলাসে কিংবা ব্রহ্মলোকে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শচীদেবী পরাশ্রয় গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতা হইলেন।

তখন বিদ্যুৎ শচীকে ছদ্মবেশ-গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শও শচীদেবীর মনঃপূত হইল না।

অনন্তর বিদ্যুৎ মায়াবনের সৃষ্টি করিলেন। মায়াবন-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এদিকে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত মাতৃসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে মাতাপুত্রে মিলন হইল। মাতাপুত্রে অনেক সস্নেহ ও সকরুণ কথোপকথন হইল। জয়ন্ত সমুদয় শ্রবণ করিলেন।

এদিকে বনমধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতে করিতে বিদ্যুৎ দূতসহ অসুর-সেনাপতি ভীষণের সাক্ষাৎ পাইলেন। ভীষণের সহিত কিছুক্ষণ রঙ্গ করিয়া বিদ্যুৎ তাহাকে শচীর নিকট লইয়া গেলেন। অসুরদ্বয় দেবরাণীর সেই গৌরবমণ্ডিত তেজোময় আকৃতি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া রহিল। এমন সময় জয়ন্ত আসিয়া ভীষণের প্রাণসংহার করিয়া তাহার আগমনের উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ। এই সর্গের প্রথমেই দেবগণ স্বর্গ আক্রমণ করিয়াছেন। বৃত্র দানবগণের অযোগ্যতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন

এবং স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন বলিয়া শিবপ্রদত্ত ত্রিশূল আনিতে আদেশ করিলেন। তখন বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

এমন সময়ে দূত ভীষণ-বধের সংবাদ লইয়া অসিল। তখন দৈত্যরাজ পুত্রকে শচী-আনয়নে যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন। রুদ্রপীড় মাত্র শত যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া শচী-হরণে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম সর্গ। দৃশ্য কুমেরুশিখর। ইন্দ্র নিয়তির তপস্যায় নিযুক্ত। যুগ-যুগান্তে ইন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হইলে নিয়তি দেবী তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ইন্দ্র নিয়তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে কি উপায়ে বৃত্র নিহত হইবে ? নিয়তি তাঁহাকে শিবলোকে যাইতে পরামর্শ দিলেন। ইন্দ্র দেবদূত স্বপ্নের দ্বারা এই সংবাদ দেবগণের নিকট প্রেরণ করিয়া স্বয়ং কৈলাসধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম সর্গ। রুদ্রপীড়-পত্নী ইন্দুবালা রতির নিকট বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছিলেন। ইন্দুবালাকে সম্বোধন করিয়া রতিদেবী বলিলেন, ঃ "তুমি বীরপত্নী, তোমার এত ভয় কেন ?" তখন—

"কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
'বীরপত্নী হায় সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে !
পতি যোদ্ধা যার, তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে কজন, ভাবে সে কজন
বীরপত্নী কিসে হয় !

কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধ পণ !
যশঃ তৃষা হায় মিটে না কি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন ?
পল-অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি'।
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে,
সমরের দাহ সহি' !

আমিও রমণী রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিঠুর
ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই,
মহাবীর পতি মম !
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম'।"

রতির মুখে শচীদেবীর প্রশংসা শুনিয়া ইন্দুবালা বলিতেছে

"আমারে লইয়া কন্দর্প-কামিনী,
চল সে পৃথিবী-'পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন,
ধরিব পতির কর ;

এত সাধ তাঁর করিবারে রণ
সে সাধ মিটাব আমি ;
শচী-বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী।”

ইন্দুবালা মর্তলোকে যাইতে চাহিল। রতি বলিলেন ঃ দেবব্যূহ ভেদ করিয়া মর্তে যাইতে হইবে। তখন ইন্দুবালারও স্মরণ হইল যে, তাঁহার স্বামীকেও যুদ্ধ করিয়া মর্তে যাইতে হইবে। ইন্দুবালা যুদ্ধের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন।

তখন রতি বলিতেছেন ঃ

“হায়, ইন্দুবালা, তুমি সুকোমল
পারিজাত পুষ্প যেন !
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দয় এতই কেন ?”

রতির মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া ইন্দুবালা ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন। তিনি রতিকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

“শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে
বীর তিনি রণপ্রিয় !
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়।”

নবম সর্গ। এই সর্গে নৈমিষারণ্যে জয়ন্তের সহিত রুদ্রপীড়ের যুদ্ধ ও শচীহরণ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই সর্গ বীররস-প্রধান।

নৈমিষারণ্যে জয়ন্তের সহিত শচীদেবী কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে রুদ্রপীড় আসিল। রুদ্রপীড় জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন

যে, কোন্ যোদ্ধার সহিত জয়ন্ত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। তখন জয়ন্ত শত অসুরকে এককালীন যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সূর্য্যাস্ত দেখিয়া এবং নয়জন যোদ্ধাকে হত হইতে দেখিয়া রুদ্রপীড় বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। উভয় পক্ষ রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

প্রভাতে জয়ন্ত মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। শচী অন্তরে অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া জয়ন্তকে অন্য দেবতার সাহায্য লইতে বলিলেন। কিন্তু বীর জয়ন্ত তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, একাই যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

অর্ধদিবস যুদ্ধ করিয়া জয়ন্ত আরও পাঁচজন অসুরকে বধ করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে রুদ্রপীড় তাঁহাকে ঘোরতর আঘাত করিলেন। শচী আসিয়া পুত্রদেহ কোলে করিয়া বসিলেন।

রুদ্রপীড় শচীকে স্পর্শ করিতে সাহস করিলেন না। তিনি তাঁহার নিকন্ধর নামক জনৈক অনুচরকে শচী-হরণের জন্য আজ্ঞা দিলেন।

আজ্ঞা পাইয়া নিকন্ধর শচীকে চুলে ধরিয়া তুলিল। অতঃপর অসুরেরা শচীদেবীকে কেশে ধরিয়া শূন্যপথে লইয়া চলিল।

এদিকে রুদ্রপীড় স্বর্গে আসিয়া দেখিলেন, দেবগণ পরাভূত হইয়াছেন।

শচীকে অসুরেরা বৃত্রের সভাতলে লইয়া আসিল। শচীদেবীকে দেখিয়া দৈত্যপতি—

"চমকি' সম্ভ্রমে উঠি' যেন দাঁড়াইল।"

দশম সর্গ। দশম সর্গারম্ভে ইন্দ্রের কৈলাসপুরে যাত্রা বর্ণিত

হইয়াছে। কৈলাসে শঙ্কর এবং উমা নানাবিধ অতি গূঢ় আলোচনায় আনন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন, এমন সময় ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া সকল সংবাদ নিবেদন করিলেন। এই সময় সহসা শিবের জটা কম্পিত হইল, ইন্দ্রের হস্ত হইতে কার্মুক স্খলিত হইল এবং গৌরীর নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। শচীদেবীর ক্রন্দন কৈলাসে ধ্বনিত হইল। শচীর ক্রন্দন শুনিয়া ইন্দ্র দ্রুতবেগে স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। শিব তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। ইন্দ্র তখন তাঁহাকে মহাতেজোময় দৃপ্ত বাক্যে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মহাদেবও বৃত্রের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া সংহারমূর্তি ধারণ করিলেন। বিশ্বধ্বংসের আশঙ্কায় পার্বতী তাঁহাকে শান্ত করিলেন। তিনি তখন ইন্দ্রকে বদরী আশ্রমে দধীচির নিকট যাইতে উপদেশ দিলেন। দধীচির অস্থিতে বৃত্রবধের জন্য বজ্র সৃষ্ট হইবে।

একাদশ সর্গ। স্বর্গে দৈত্যগণের বিজয়োৎসব। বৃত্র ও বৃত্রপুত্র উভয়ে পরস্পর যুদ্ধবিজয়-সংবাদ কহিতে লাগিলেন।

শচীর আনয়ন-সংবাদে ঐন্দ্রিলা আনন্দিতা হইয়া পুত্রকে তাঁহার রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রুদ্রপীড় শচীর প্রশংসা করিলেন। ঈর্ষাপরায়ণা ঐন্দ্রিলা পুত্রের মুখে শচীর প্রশংসা শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই স্বামীকে আদেশ করিলেন যে, তখনই শচীকে আনাইয়া তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত করা হউক :

"অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ।"

শচীদেবীর অবমাননার এই সঙ্কল্পের কথা গৌরী মহাদেবকে জানাইলেন। তখন—

"মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি' গগনমণ্ডল ;
বাজিল প্রলয়-শৃঙ্গ শ্রুতি-বিদারণ,
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন,
সংহার ত্রিশূলাকৃতি, জ্যোতি বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত-'পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ,
অচল ছাড়িয়া কূর্ম উঠে অদ্রিবৎ,
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত,
উত্তাল হিল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত,
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জয়,
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি' রয়,
বিদীর্ণ বিমানমার্গে গিরিশৃঙ্গ পড়ে,
চেতনে জড়ের গতি, গতি প্রাপ্ত জড়ে,
টলমল টলমল ত্রিদশ-আলয়,
মূৰ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা উদয়,
দোদুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরুশিখর,
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।
ঐন্দ্রিলার হস্ত হ'তে খসিল কঙ্কণ,
রুদ্রপীড়-অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ,
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
'রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন' বলিয়া উঠিল।"

'বৃত্রসংহার' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবামাত্র তাহা পাঠক-সমাজে

যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইল। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এই পুস্তক-খানির যথেষ্ট প্রশংসাসূচক সমালোচনা করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছিলেন: "আমরা বৃত্রসংহার পাঠ করিয়া অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, হেমবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া বাংলা সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিতে থাকুন।"

'বৃত্রসংহার' প্রথম খণ্ডের অপূর্ব সমাদর-লাভের পর হেমচন্দ্রের মনেও গভীর আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তিনি অসীম উৎসাহের সহিত 'বৃত্রসংহার'-এর উত্তরার্ধ-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তের

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সমগ্র ভারতময় এক মহা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল:

"চারিদিক যুড়ি বাজিল বাদন,
বাজিল বৃটিশ দামামা-কাড়া,
অর্ধ ভূমণ্ডল করি' তোলপাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।"

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের (তখন যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্স্) ভারতে আগমন-উপলক্ষে এই উৎসব।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর যুবরাজ ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া রাজধানী কলিকাতা নগরীতে উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ প্রায় সকল কবিই কবিতাদি রচনা রচনা করিয়া রাজভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। মহাকবি

হেমচন্দ্রের বীণাও এই সময় নীরব থাকে নাই। তিনি এইসময় মর্মস্পর্শিনী ভাষায় 'ভারত-ভিক্ষা' গাহিয়াছিলেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, উহার নাম **'আশাকানন'**। আশাকাননের কল্পনা যেরূপ সরল ও মধুর, উহার ভাষা ও ছন্দও সেইরূপ সরল ও মধুর। যে-দামোদর নদের তীর হইতে কবি স্বপ্নের রাজ্যে গমন করিয়া আশাদেবীর সাক্ষাৎ পান, গ্রন্থারম্ভে সেই নদের তীরের কী সুন্দর বর্ণনা :

> "বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ ক্ষীরসম স্বাদু নীর,
> বৃক্ষ নানাজাতি বিবিধ লতায় সুশোভিত উভ তীর ;
> বিন্ধ্যগিরি শিরে জনমি যে নদ দেশ-দেশান্তরে চলে,
> সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত সুধৌত নির্মল জলে।"

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'বৃত্রসংহার' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি দ্বাদশ হইতে চতুর্বিংশ সর্গ—এই ১৩টি সর্গে বিভক্ত।

দ্বাদশ সর্গ। একাদশ সর্গের শেষে ঐন্দ্রিলা-কৃত শচীর অপমানে মহাদেবের ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। দ্বাদশ সর্গের প্রথমে সেই ক্রোধাগ্নি-শিখা দেখিয়া বৃত্রাসুর স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন। বৃত্রের ইচ্ছা হইল, শচীদেবীকে মুক্ত করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করেন। তিনি পত্নী ঐন্দ্রিলার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু শচীদেবীকে মুক্ত করিতে ঐন্দ্রিলা অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। বৃত্র তাঁহার অনিচ্ছা উপেক্ষা করিয়া রতিকে শচী-আনয়নে আদেশ করিলেন, অভিপ্রায়—তাঁহাকে কারামুক্ত করিবেন। অনন্তর বৃত্র প্রাচীরে আরোহণ করিয়া দেবশিবির দেখিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ। শিবের আদেশানুসারে ইন্দ্র পৃথিবী-তলে অবতরণ করিয়া বজ্রসৃষ্টির জন্য দধীচির অস্থি-সংগ্রহ-মানসে অরণ্যের মধ্য দিয়া তদীয় আশ্রমে গমন করিতেছেন। তখন স্বর্গচ্যুতা দেবকন্যাগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা ইন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার নিকট দধীচির চরিত্র বর্ণনা করিয়া বলিলেন ঃ

"জীব-উপকারে ঋষি জগতে অতুল !
ব্রত পর-উপকার স্বার্থ-পরিহার ;
কল্পনা, কামনা, চিন্তা পরের মঙ্গল,
কিবা কীট কি পতাঙ্গ সদা দয়াশীল
মুনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—জীবচূড়ামণি।"

দেবকন্যাগণ ইন্দ্রকে দধীচির আশ্রমের পথ দেখাইয়া দিলেন।

আশ্রমে প্রবেশ করিলে ঋষি ইন্দ্রকে বন্দনা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু ইন্দ্র ঋষির প্রাণ ভিক্ষা-স্বরূপ চাহিতে আসিয়াছেন, তিনি কিরূপে সেই নিষ্ঠুর বাণী মুখে আনিবেন! তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঋষি ধ্যানযোগে দেবরাজের আগমনের কারণ অবগত হইয়া মহানন্দে কহিলেন ঃ

"পুরন্দর শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম।
এ জীর্ণ পঞ্জর-অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি।
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের (ও) অতীত।"

অতঃপর ঋষি দধীচি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করিলেন।

চতুর্দশ সর্গ। স্বর্গে ইন্দ্রাণী বন্দিনী। তাঁহার হৃদয়ে সুখ নাই, আনন্দ নাই,—শান্তি নাই।

শচীদেবী রোদন করিতেছিলেন, এমন সময় রতি আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, দৈত্যরাজ তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য ডাকিয়াছেন। শচী দৈত্যপতির করুণার দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতা হইলেন।

পঞ্চদশ সর্গ। এই সর্গে দেবাসুর-যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে দেবগণ দানবদিগকে প্রায় পরাজিত করিয়াছিল। দৈত্যদিগের পরাভব দেখিয়া বৃত্র শিব-প্রদত্ত ত্রিশূল নিক্ষেপ করিলেন। অব্যর্থ ত্রিশূলের ভয়ে দেবগণ লুক্কায়িত হইলেন। ত্রিশূল লক্ষ্য-স্থলের সন্ধান না পাইয়া বৃত্রের হস্তে ফিরিয়া আসিল।

ষোড়শ সর্গ। পঞ্চদশ সর্গে যেমন বৃত্রের রণজয়,—ষোড়শ সর্গে তেমনি ঐন্দ্রিলার রণজয়। বৃত্রের রণজয় শিবের ত্রিশূলে,—ঐন্দ্রিলার রণজয় মন্মথের ফুলধনু লইয়া।

ঐন্দ্রিলার আদেশে মদন স্বর্গে এক অপূর্ব শোভাপূর্ণ নিকুঞ্জ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐন্দ্রিলা সেই কুঞ্জবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রতি আসিয়া তাঁহাকে শচীদেবীর দর্পিত উত্তর শুনাইলেন। ঐন্দ্রিলা বলিলেন, তিনি স্বয়ং শচীকে আনিতে যাইবেন।

রতি তাঁহাকে অপূর্ব সাজে সাজাইলেন। এমন সময়ে বৃত্র রণ-জয় করিয়া আসিলেন। কুঞ্জের শোভা এবং ঐন্দ্রিলার সাজ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। ঐন্দ্রিলাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে

তিনি বলিলেন যে, শচীর দর্প চূর্ণ করিবার জন্যই তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুনিয়া বৃত্র ক্রুদ্ধ হইলেন। শেষে তিনি কহিলেন ঃ

"তোমায় সুন্দরী,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্র-সহচরী,
যে-বাসনা তব, তার দর্প হরি'
পূরাও মহিষি ;—ফণা চূর্ণ করি'
আন ফণিনী।"

ঐন্দ্রিলা আনন্দে অধীর হইয়া শচীর দর্প চূর্ণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

সপ্তদশ সর্গ। রুদ্রপীড় অগ্নি ও জয়ন্তের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সেই অপমানে দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি পুনরায় যুদ্ধে যাইবার জন্য পিতার অনুমতি চাহিলেন। যথার্থ বীরের ন্যায় বৃত্র অনুমতি দিলেন ঃ

"যাও রণে অরিন্দম, পুত্র রণজয়ী,
পাল বীরধর্ম, ভাগ্যে যা থাকে আমার।"

অতঃপর রুদ্রপীড় জননীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পত্নী ইন্দুবালার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। কিন্তু কোমলহৃদয়া ইন্দুবালার প্রাণে সহ্য হয় না যে, কেহ যুদ্ধ করে। ইন্দুবালা কিছুতেই স্বামীকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না, রুদ্রপীড়ও যুদ্ধে যাইবেন। অবশেষে ইন্দুবালা স্বামীকে যুদ্ধে যাইবার অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। তিনি স্বামীর মঙ্গলের জন্য শিবের পূজা করিতে গেলেন। অতঃপর রতি তাঁহাকে শচীর নিকট লইয়া গেলেন।

অষ্টাদশ সর্গ। এই সর্গে রতি ইন্দুবালাকে শচীর নিকট লইয়া

গিয়াছেন। শচী তাঁহাকে নানাকথায় ভুলাইতেছেন, এমন সময় অপূর্ব সাজে সজ্জিত হইয়া ঐন্দ্রিলা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঈর্ষান্বিতা ঐন্দ্রিলা শচীপদতলে পুত্রবধূ ইন্দুবালাকে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি শচীর বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া পদাঘাতের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় শিবদূত বীরভদ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে সকল গোলমাল মিটিয়া গেল। বৃত্র-নিধন যে অতি সন্নিকট, তাহা ঐন্দ্রিলাকে শুনাইয়া বীরভদ্র শচীকে সুমেরু-শিখরে লইয়া গেলেন। ইন্দুবালাও শচীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

উনবিংশ সর্গ। এই সর্গে দধীচির অস্থি লইয়া বিশ্বকর্মার শিল্প-শালায় ইন্দ্রের আগমন ও বিশ্বকর্মা কর্তৃক বজ্র-নির্মাণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

বিংশ অধ্যায়। এই সর্গে রুদ্রপীড়ের যুদ্ধ। যুদ্ধে দেবগণ পরাভূত হইলেন। স্বর্গদ্বার হইতে বিতাড়িত দেবগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, ইন্দ্র ব্যতীত যদি যুদ্ধজয় অসম্ভব হয়, তবে যুদ্ধ করিয়া লাভ কি! সূর্যদেব পরামর্শ দিলেন, যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সকলে প্রলয়-মূর্তি ধারণ করুন, কিংবা ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় উপস্থিত করা হউক।

কিন্তু দৈত্যের বিনাশের জন্য ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট করা দেবোচিত কার্য নহে বলিয়া বরুণ দেবগণকে নিরস্ত করিলেন। যখন দেবগণ এইরূপ পরামর্শে ব্যাপৃত, তখন সহসা ইন্দ্র আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

একবিংশ সর্গ। রুদ্রাণী ইন্দ্রাণীর অপমানে মর্মপীড়িতা হইয়া

বৃত্রবধের পরামর্শের জন্য ব্রহ্মার নিকটে গেলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে ও উমাকে লইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব বৃত্র কর্তৃক শচীর অপমানের কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ। ঐন্দ্রিলা বলিলেন, শচী তাঁহার পুত্রবধূ ইন্দুবালাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছেন, ইহাতে বৃত্রের অপমান করা হইয়াছে। অতঃপর সুমেরুশিখরে ইন্দুবালাকে লইয়া শচী নির্বিঘ্নে কিরূপে অবস্থান করিতেছেন, ঐন্দ্রিলা ক্রুদ্ধ অসুরকে তাহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। বৃত্র দেখিবার জন্য স্বর্গের প্রাচীরে উঠিলেন। তখন দেবাসুরে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রুদ্রপীড় অপূর্ব সংগ্রামে দেবগণকে বিমুখ করিতেছেন। বৃত্র পুত্রকে সাধুবাদ করিয়া উৎসাহিত করিলেন।

বৃত্রাসুর চলিয়া গেলে রুদ্রপীড় দেবগণকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অপূর্ব বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। ইন্দ্র বলিলেন ঃ

"এহেন বীরের শব পবিত্র জগতে।"

তিনি নিজ পুষ্পক রথে মৃতদেহ উঠাইয়া বীরোচিত সম্মানের সহিত তাহা স্বর্গে প্রেরণ করিলেন।

রুদ্রপীড়ের মৃতদেহ বৃত্রসভায় আনীত হইলে—

"উচ্ছ্বাসিল সভাস্থলে শোকের নিশ্বাস।"

ত্রয়োবিংশ সর্গ। রুদ্রপীড়ের শব দেখিয়া ঐন্দ্রিলা যেভাবে বিলাপ করিয়াছেন তাহা অতিশয় মর্মস্পর্শী। পুত্রশোকাতুর বৃত্র ঐন্দ্রিলাকে বিলাপ করিতে নিষেধ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে আবার যুদ্ধ হইবে। দানবপুরীতে সেই কাল-রজনীতে ভীষণ রণসজ্জা হইতে লাগিল। পরদিন দানবকুল-ধ্বংস হইবে।

চতুর্বিংশ সর্গ। এই সর্গে বৃত্রবধ এবং কাব্যসমাপ্তি। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ইন্দ্র কাতর দেবগণকে পটগৃহে আহ্বান করিলেন। তিনি বৃত্র-বধের অব্যর্থ অস্ত্র বজ্র পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মদিবা শেষ না হইলে বৃত্রনিপাত হইবে না। সূর্য বলিলেন, তিলার্ধ বিলম্ব না করিয়া বজ্র নিক্ষেপ করা হউক। ইন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন। কিন্তু সূর্য কিছু ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি নানাভাবে ইন্দ্রকে ভৎ‍সনা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর দেব-দানবের আশ্চর্য যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্র ও জয়ন্তের নিধনকল্পে বৃত্র শৈবশূল নিক্ষেপ করিলেন। শূল ব্যর্থ দেখিয়া বৃত্র "হা শম্ভু, তুমিও বাম!" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। পরে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রণসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন। তখন ইন্দ্র বজ্র ত্যাগ করিলেন ঃ

"ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বর
যেখানে অসুরপতি বিশালশরীর,
বিশাল নগেন্দ্র-তুল্য, ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে—পড়িল অসুর
বিন্ধ্য ধরাধর যেন পড়িল ভূতলে!"

এইরূপে স্বর্গজয়ী বীর বৃত্র তাঁহার দাম্ভিকতা ও অত্যাচারের প্রতিফল পাইলেন।

চৌদ্দ

বাংলার শিক্ষিত সমাজের অনুরোধে বৃত্রসংহারের মহাকবি পুনরায় গীতিকবিতার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই **'কবিতাবলী'**, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে দ্বাদশটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

'কবিতাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার দুই সপ্তাহের মধ্যে হেমচন্দ্রের আর একখানি অভিনব-কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহার নাম **'ছায়াময়ী'**।

সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করায় হেমচন্দ্রের ওকালতি-ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছিল, তথাপি তিনি হাইকোর্টের অন্যতম প্রধান উকিল ছিলেন। হাইকোর্টের একজন বড় উকিলের পক্ষে কাব্যাদি-রচনায় অবসর করিয়া লওয়া সহজসাধ্য নহে। কিন্তু হেমচন্দ্র তাঁহার সময়ের সুন্দর বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন এবং সচরাচর নির্দিষ্ট কার্য নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেন। প্রাতঃকালে তিনি মক্কেলদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন। আহারান্তে হাইকোর্টে যাইতেন। হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন অথবা নূতন পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকাদি পাঠ করিতেন। পরে আহারাদি করিয়া রাত্রি ৮৷৷টা-৯টার সময় নিদ্রা যাইতেন। রাত্রি ২টা-২৷৷টার সময় উঠিয়া কাব্যাদি রচনা করিতেন।

একবার হেমচন্দ্র এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— ওকালতি করিয়া তিনি কাব্য রচনার এত সময় পান কিরূপে?

হেমচন্দ্র উত্তরে বলিলেন : "কি করিয়া কাব্য লিখি তাহা জানি না, তবে আমার ইচ্ছা হয়, যদি কেহ আমার পরিবার ও আশ্রিতগণের ভরণপোষণের ভার লয়, তাহা হইলে আমি আমার জীবনের সমস্ত সময় বাণীর চরণে উৎসর্গ করিয়া আমার জীবন সার্থক করি।"

হেমচন্দ্র যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, প্রাণপণে তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যে-মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন, তাহা উপযুক্ত ভাবে চালাইবার জন্য যথোচিত পরিশ্রম করিতেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে হেমচন্দ্র একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার নাম '**দশমহাবিদ্যা**।' এই গ্রন্থখানি ভাবের মাধুর্যে ও ভাষার মনোহারিত্বে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এক অপূর্ব স্থান অধিকার করিয়াছে। 'দশমহাবিদ্যা'য় কবি বাংলা সাহিত্যে এক নূতন সুর দিয়াছেন। ইহাতে নূতন নূতন রাগিণীর অবতারণা করিয়াছেন।

পসার

হেমচন্দ্র কাব্য-জগতে যতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন, বাগ্দেবীর উপাসনাতে ততই নিবিষ্ট চিত্তে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। বাগ্দেবীর অর্চনায় তিনি যত মনোযোগী হইয়াছিলেন, যদি মা কমলার কৃপালাভে ততটা হইতেন তবে তাঁহার ওকালতির পসার বোধ হয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইত।

লক্ষ্মীর অর্চনায় অমনোযোগী হইলেও দেবী যেন অযাচিতভাবে তাঁহার উপর কৃপা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন হেমচন্দ্র হাইকোর্টের সরকারী উকিল হইলেন, তখন তাঁহার যেমন জলের

মত অর্থ আসিতে লাগিল, ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া তিনি সেই অর্থ তেমনই জলের মতই দুই হাতে ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার অর্থ-ব্যয় দেখিয়া মনে হইত যে, অর্থের যে কোনও আবশ্যকতা আছে বা ভবিষ্যতের জন্য কিছু অর্থসঞ্চয় আবশ্যক, একথা তিনি মুহূর্তের জন্যও মনে করিতেন না। অর্থের প্রতি এই অনাদর ও অমিতব্যয়িতার ফল তাঁহাকে শেষ জীবনে মর্মে মর্মে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কাব্য-রচনায় হেমচন্দ্র এতদূর তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি বন্ধুবান্ধবদের বলিতেন, যদি কেহ তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করে, তবে তিনি অর্থোপার্জনের চেষ্টা এবং চিন্তা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া কেবল কাব্য-রচনাতেই ডুবিয়া থাকিতেন।

হেমচন্দ্র সাধারণতঃ শেষরাত্রিতেই কাব্য রচনা করিতেন। কখনও কখনও তাঁহার সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় লেখনী হস্তেই কাটিয়া যাইত।

একে হাইকোর্টের সরকারী উকিলের গুরু দায়িত্ব, তাহার উপর আবার কাব্য-রচনার পরিশ্রম, এই উভয়বিধ কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যে ভাঙ্গন ধরিল, দৃষ্টি-শক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও হেমচন্দ্র সাবধান হইলেন না। ক্ষীণ দৃষ্টি লইয়াও তিনি কাব্য-রচনা এবং সরকারী উকিলের গুরু দয়িত্ব সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তিনি চিরজীবনের মত চক্ষুরত্ন দুইটি হারাইয়া অন্ধ হইয়া ঘরে বসিলেন।

অন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্রের দুর্দশার সূত্রপাত হইল। ধীরে ধীরে অর্থকষ্ট ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। চক্ষুই মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন, সেই রত্ন হইতে বঞ্চিত হইলে মানুষের আর কিছুই থাকে না। শরীর ও মন কর্মঠ ও সবল থাকিলেও দৃষ্টিশক্তিহীন মানুষ একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। হেমচন্দ্রেরও সেই দশা ঘটিল, চক্ষুরত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হইয়া ঘরে বসিলেন। তাঁহার ওকালতি-ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ওকালতিই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান আয়ের পথ, সে-পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার অর্থোপার্জন একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল।

যখন অজস্র অর্থোপার্জন হইত, তখন হেমচন্দ্রের অর্থের প্রতি কোনও মায়া-মমতা ছিল না, ভবিষ্যতে যে অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে, একথা একদিনের জন্য তাঁহার মনে উদিত হয় নাই, একটি পয়সাও ভবিষ্যতের জন্যও রাখিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। এক হাতে তিনি অর্থোপার্জন করিতেন, আর এক হাতে তাহা তিনি নিঃশেষে ব্যয় করিয়া ফেলিতেন, কাল যে কি হইবে, একথা ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। কাজেই যেই দিন হইতে তাঁহার ওকালতি বন্ধ হইয়া গেল, সেই দিন হইতেই তাঁহার দারিদ্র্যের সূত্রপাত হইল।

হেমচন্দ্র চক্ষুরত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়া এমনই অর্থকষ্টে নিপতিত হইলেন যে, তাঁহাকে অপরের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। 'বৃত্রসংহার-এর কবির দুরবস্থার সংবাদ শুনিয়া দেশের অনেক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন।

তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র 'হিতবাদী'র পক্ষ হইতে তখন গ্রাহকদিগকে হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ইহাতে হেমচন্দ্রের অর্থকৃচ্ছ্রতা কিঞ্চিৎ দূরীভূত হইল।

হায়, একদিন যে হেমচন্দ্র মুক্তহস্তে দরিদ্রের দারিদ্র্য-নিবারণের জন্য অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতেন না, কোনপ্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না, আজ সেই পরদুঃখ-কাতর হেমচন্দ্রকে পরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া দুঃসহ দারিদ্র্যের কশাঘাত মর্মে মর্মে অনুভব করিতে হইল! হেমচন্দ্রের শেষজীবনের এই দৃষ্টান্ত সংসারী জীবের শিক্ষার একটি চরম আদর্শ।

হেমচন্দ্রের গুণগ্রাহী বন্ধুগণ তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য নানাভাবে সাহায্যে করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় গভর্নমেণ্ট মহাকবিকে মাসিক পঁচিশটাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

এই হতভাগ্য দেশে ধনীর বরপুত্র এবং রাজা-মহারাজের অভাব নাই। সরকারী চাঁদার খাতায় তাঁহারা অকাতরে অর্থ দান করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের দেশের যে এমন একজন কৃতী মহাকবি অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছেন, সে-বিষয় কাহারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। অপর কোনও দেশ হইলে এইরূপ একজন মহাকবিকে গভর্নমেণ্টের সামান্য ২৫৲ টাকার বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া দিনযাপন করিতে হইত না। চারিদিক হইতে দেশবাসীর স্বতঃপ্রবৃত্ত মুক্তহস্তে দানে কবির জীবন বেশ সুখে অতিবাহিত হইতে পারিত, তাঁহাকে দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত হইতে হইত না।

গভর্নমেণ্টের প্রদত্ত সেই মাসিক পঁচিশ টাকা সম্বল করিয়াই

হেমচন্দ্রকে কাশীধামে গিয়া বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার চরণপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

শেষজীবনের সেই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি কতকগুলি দুঃখের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিলে নিতান্ত পাষাণের হৃদয়ও দারুণ দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া গলিয়া যায়।

অবশেষে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নানা দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বাংলার মহাকবি ৬৫ বৎসর বয়সে কাশীধামে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার চরণতলে চিরশান্তি লাভ করেন।

সমাপ্ত